BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 107-134

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

গৌরাঙ্গ নন্দী
সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, খুলনা ব্যুরো, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : gouranga.nandy@gmail.com

সারসংক্ষেপ

দুনিয়াজুড়ে বর্তমান সময়ে ব্যাপক আলোচিত বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে দুনিয়ার উপকূলবর্তী দেশগুলোর সাগরের তলায় ডুবে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে। এর জন্যে দায়ী মানুষের ভোগ-বিলাসের কারণে তৈরি হওয়া উপজাত কার্বন ডাই আক্সাইড গ্যাস, যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তরের বরফ গলছে, সেই বরফগলা পানিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং তা উপকূলের দ্বীপসদৃশ দেশগুলো ডুবিয়ে দিতে আসছে। এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বাড়ছে লবণাক্ততা এবং পাল্টে যাচ্ছে জীবন-জীবিকার ধরন। এর পাশাপাশি প্রকৃতিতে ইতোমধ্যে শুরু হওয়া আরও একটি বড় প্রতিক্রিয়া হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়া। এতে ঘন ঘন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ বাড়বে। এই দুর্যোগ হতে রেহাই পেতে প্রয়োজন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানো। কিন্তু ধনী ও উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে না। নিকট অতীতে কার্বন নিঃসরণে আমাদের অবদান ছিল না বললেই চলে; কিন্তু সম্প্রতি আমরাও কার্বন নিঃসরণ করছি। এর প্রবণতা এমনি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরাও অন্যতম প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারি। একটি বিষয় খুবই আশ্চর্যের যে, এমন একটি দুর্যোগ আমাদের সামনে থাকলেও সকল দেশ এ নিয়ে তেমন চিন্তিত নয়, বরং কোনো কোনো দেশ এটিকে উপেক্ষা করে থাকে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতি দুই বছরে দেশগুলো একটি বৈঠকে - কপ (কনফারেন্স অব পার্টি) এ মিলিত হয়। এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়, বারেবারে উচ্চারিত হয় কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসার কথা। কিয়োটো প্রটোকলে এ বিষয়ে অনেক অঙ্গীকার-উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। বালি (কপ) সম্মেলনে আশার আলো দেখা দিয়েছিল; প্যারিসে (কপ) ২০১৬ সালে একটি চুক্তিও হয়েছিল কার্বন নিঃসরণের মাত্রা দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। কিন্তু আমেরিকা এই চুক্তি হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। এমনকি ট্রাম্প প্রশাসন চুক্তি হতে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি, এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে; মোটাদাগে কী আলাপ-আলোচনা চলছে, অন্যদিকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দও বা কী বলছেন, তাই পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি কি একেবারেই কল্পকথা (মিথ), না-কি এর কোনো বাস্তবতাও আছে।

মূলশব্দ

জলবায়ু পরিবর্তন, ঝুঁকি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, উপকূল, কার্বন নিঃসরণকারী দেশ, কপ (কনফারেন্স অব পার্টি), নির্গমন হ্রাস বা কমিয়ে আনা, ধনী দেশ, নির্গমনকারী দেশ

১. ভূমিকা

উপকূলীয় ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। এদেশে ঝড়-বন্যা-নদীভাঙনের মতো দুর্যোগগুলো নতুন নয়, বহুদিনের পুরনো এবং ঘটনাগুলো প্রাকৃতিক। তবে বিপজ্জনক হচ্ছে, প্রাকৃতিক এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে মানুষের অদূরদর্শী কিছু কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় দুর্যোগগুলো আরও জোরালো ও তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক ঘটনার চেয়েও অপ্রাকৃত বা মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় যে ক্ষতি তা এই মানুষের সমাজেই আঘাত হানতে শুরু করেছে। এমনি একটি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা এখন মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে উপায় খুঁজছি। উপকূলীয় জন-জীবন এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। দুই বছরের মধ্যে (২০০৭এর ১৫ নভেম্বর সিডর ও ২০০৯এর ২৫ মে আইলা) বাংলাদেশের উপকূলভাগে দু'টি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং তারপর থেকে প্রতি বছরেই বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আন্দামান সাগর প্রভৃতিতে একাধিক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এমন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা আরও বাড়বে এবং সমানতালে বেড়ে যাবে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে, বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের (কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন, সালফার, মিথেন প্রভৃতি) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা দ্রুতহারে বাড়ছে। আর উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। উপরন্তু গরমের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রের পানির প্রসারণ (thermal expansion) ঘটছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের এই বর্ধিত পানিরাশি উপকূল এলাকা ছাপিয়ে নেবে। বায়ুমণ্ডলে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথাও কমে যাওয়া, কোথাও বেড়ে যাওয়া; উষ্ণ এলাকায় উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া; আবার শীত-প্রধান এলাকায় ঠাণ্ডার প্রকোপ আরও বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি। অবশ্য সাধারণভাবে আমরা জানি যে, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের গড় আবহাওয়াকেই জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে; অতি মাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস এই

স্বাভাবিক পরিবর্তনকে এক অস্বাভাবিক বিপজ্জনক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এই গোটা পরিবর্তনটিকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছেন। ইউএনএফসিসি (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) বা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসহ বিশ্বের উপকূলীয় দেশগুলোর এক বিরাট অংশ তলিয়ে যাবে।

২. উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তিনটি। এগুলো নিম্নরূপ:

ক. জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে কি-না; ঘটে থাকলে এই পরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কী, তা দেখা;

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে সম্ভাব্য কী ধরনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে দেখা;

গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশনেতৃবৃন্দ কী ভাবছেন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় কি প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন এবং তা নেয়া হচ্ছে কি না তা বিশ্লেষণ করা।

৩. পদ্ধতি

এটি একটি উদঘাটনমূলক গবেষণা। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্তের জন্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুটো উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে উপকূলের মানুষের সাক্ষাৎকার ও তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্বীকৃত জার্নাল, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার/কনফারেন্স-এর প্রতিবেদন প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ, যা ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশটির পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব সীমান্তজুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। তবে পূর্বদিকে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশটি থেকে উত্তর দিকে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, যেখান থেকে বরফগলা পানির প্রবাহে সৃষ্ট বড় বড় নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ইত্যাদি) বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবহমান এবং নদীগুলো গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্ষাকালে নদীবাহিত পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে নদী উপচে পানি লোকালয়ে ঢুকে যায়, এবং দেশটি এভাবে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়।[১]

এই দেশটির প্রায় মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে এবং এর আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। বছরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০মিলিমিটার (৬০-১০০ইঞ্চি); পূর্ব সীমান্তে এই মাত্রা ৩৭৫০ মিলিমিটার (১৫০ইঞ্চির বেশি)। স্বাভাবিক অবস্থায় গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। আবহমান কাল থেকে এদেশে ঋতুবৈচিত্র্য বর্তমান ছিল, ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে এই দেশে অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত –এই ছয় ঋতুর কারণে দেশটিকে ষড়ঋতুর দেশও বলা হয়ে থাকে। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হয়। মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল চলে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদেশে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকে, তাই জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলে বর্ষা মৌসুম। এসময় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অনেক সময় বন্যায় রূপ নেয়। এছাড়াও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পূর্বমুহূর্তে কিংবা বিদায়ের পরপরই স্থলভাগে ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কিংবা সাগরে নিম্নচাপ, জল-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, যার আঘাতে বাংলাদেশ প্রায় নিয়মিতই আক্রান্ত হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের এই স্বাভাবিক চিত্রটি এখন অনেকখানি বদলে গেছে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্তর সকল দিক দিয়ে সংঘটিত এসকল পরিবর্তন বাংলাদেশে, জলবায়ুগত পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং কেন

বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের (কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন, সালফার, মিথেন প্রভৃতি) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা দ্রুতহারে বাড়ছে। আর উষ্ণতার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। উপরন্তু গরমের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রের পানির প্রসারণ (thermal expansion) ঘটছে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের এই বর্ধিত পানিরাশি উপকূল এলাকা ছাপিয়ে নেবে।

বায়ুমণ্ডলে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথাও কমে যাওয়া, কোথাও বেড়ে যাওয়া; গরম এলাকায় গরম বেড়ে যাওয়া, আবার শীতপ্রধান এলাকায় শীতের প্রকোপ আরও বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি। জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে; অতিমাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে এক অস্বাভাবিক বিপদজ্জনক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এই গোটা পরিবর্তনটিকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছেন।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, এসিড বৃষ্টি প্রভৃতির মতো দুর্যোগের ঘনঘটা এবং ধ্বংসযজ্ঞ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ২০০৭ এবং ২০০৯ এর দু'টি ঘূর্ণিঝড়– সিডর এবং আইলার প্রচণ্ডতা এই আশঙ্কাটিকে সত্যে পরিণত করেছে। যদিও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিডর ছিল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর দিক দিয়ে ৪ নম্বর ক্যাটাগরির (ভয়াবহতার মাত্রাকে এক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে

বিজ্ঞানীরা এই ক্যাটাগরি নির্ধারণ করেছেন) এবং আইলা ছিল মাত্র এক নম্বর ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড়। আর উত্তর আমেরিকায় আঘাত করা ঘূর্ণিঝড়টিকে সর্বোচ্চ ধ্বংসযজ্ঞ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড় বলা হচ্ছে।

কেন এই জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে? এই প্রশ্নের একেবারে সাদামাটা জবাব হচ্ছে, বাতাসে কার্বনআশ্রিত বা গ্রীনহাউজ গ্যাস বেশি পরিমাণে নির্গমন হচ্ছে বলেই জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে (মনে রাখতে হবে, জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন আছে; শুধুমাত্র জলবায়ু নয়, প্রকৃতির সকল বিষয়েই একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে)। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন দেশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন করছে এবং কেন-ই-বা তারা এই গ্যাস নির্গমন বন্ধ করছে না। ধনী তথা শিল্পোন্নত দেশগুলোই এই অতিরিক্ত মাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন করছে। ধনী দেশগুলোর শিল্প-কলকারখানা এবং সেই দেশগুলোর নাগরিকদের আরাম-আয়েশের জন্যে ব্যবহৃত গাড়ি, ফ্রিজ, এয়ার-কন্ডিশনার প্রভৃতি থেকে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গত হচ্ছে। আর ধনী দেশগুলোর এই আরাম-আয়েশের বিষে আমাদের মতো উপকূলীয় গরীব দেশগুলোর বিপন্নতা ও নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতিতে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে, আর এতে ক্ষয়-ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। এসব দুর্যোগের মধ্যে বন্যাঝুঁকি, স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে।

বন্যাঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ৪ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যাঝুঁকিতে পড়তে পারে। আগের পূর্বাভাস হতে যা প্রায় ৯ গুণ বেশি।[২] আগের পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫০ লাখ মানুষের বন্যাঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় নতুন এই সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন ২৯ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী 'নেচার' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাটি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ক্লাইমেট সেন্ট্রাল' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা ডিজিটাল এলিভিয়েশন মডেলিং (ডিইএম) ব্যবহার করে স্যাটেলাইটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এই গবেষণাটি করেছে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, যে হারে বাতাসে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে এবং পৃথিবীর উষ্ণতা যে হারে বাড়ছে, যদি তা একই রকম থাকে, তবে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বাড়বে; এর প্রভাবে পৃথিবীর ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাজনিত কারণে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ছয়টি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এগুলো হচ্ছে– চীন, বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড। বলা হচ্ছে, চীনে ক্ষতির আশঙ্কাটি সবচেয়ে বেশি- ৯ কোটি ৩০ লাখ, বাংলাদেশে ৪ কোটি ২০ লাখ, ভারতে ৩ কোটি ৬০ লাখ, ভিয়েতনামে ৩ কোটি ১০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ২ কোটি ৩০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ক্ষতির শিকার হতে পারে। এর আগের পূর্বাভাস মতে, চীনে ২ কোটি ৯০ লাখ, বাংলাদেশে ৫০ লাখ, ভারতে ৫০ লাখ, ভিয়েতনামে ৯০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ৫০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১০ লাখ মানুষ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল।

২০৫০ সাল নাগাদ বন্যা-ঝুঁকি : ক্লাইমেট সেন্ট্রাল

পানি ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত এ বিষয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবো, তাতো পুরনো কথা। ২০০৯ সাল থেকে আমরা বলছি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে আমাদের উপকূলভাগ তলিয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে আমরা তলিয়ে যাবো না; কারণ, আমাদের উপকূল জুড়ে ১৫ ফুট উচ্চতার বাঁধ আছে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, জলোচ্ছ্বাস। যদি জলোচ্ছ্বাস বিশ ফুট উচ্চতার হয়, তবে আমরা তা ঠেকাতে পারবো না। তবে বাংলাদেশ সরকার বিশ ফুট উচ্চতা বাঁধের পরিকল্পনা করে এগুচ্ছে। আমরা নিকট অতীতেই দেখেছি, জাপানে ত্রিশ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। এমন জলোচ্ছ্বাস আমাদের অঞ্চলে হলে সেটি খুবই বিপজ্জনক হবে।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কানাডার উত্তর অঞ্চল, গ্রীনল্যান্ড, রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক-এর মতো

দু'একটি অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গাতেই কম-বেশি ক্ষতি হবে। দুর্যোগের মাত্রা বাড়বে। ইতিমধ্যে আমরা সে আলামতও দেখছি। ক্যালিফোর্নিয়াতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে এবং দুনিয়াজুড়ে বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

আগের পূর্বাভাসে বন্যা-ঝুঁকি প্রবণতা : ছবি : ক্লাইমেট সেন্ট্রাল

সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, উষ্ণায়নের এই প্রক্রিয়া থামানো না গেলে ২১০০ সাল নাগাদ এই ছয়টি দেশের ২৫ কোটি মানুষ বসবাস করে যে ভূমিতে তা জোয়ারের পানির তলায় নিমজ্জিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচ কোটি মানুষ ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া এশিয়ার অন্য পাঁচটি দেশের মধ্যে চীনের ৮ কোটি ৭০ লাখ, ভারতে ৩ কোটি ৮০ লাখ, ভিয়েতনামে ৩ কোটি ৫০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ২ কোটি ৭০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতির শিকার হতে পারে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় সকল জেলা – সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের কোথাও কোথাও বেশি বা অংশবিশেষ এলাকা ছাড়াও যশোর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর,

ঢাকা জেলার কিছু অংশ এবং হাওড় এলাকার একটি অংশ ক্ষতির শিকার হতে পারে। সাধারণভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে জোয়ারের চাপ বাড়বে; এতে জোয়ারের পানি নদীগুলো দিয়ে উজানের (উত্তরের) দিকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে আসবে। পানির প্রবল চাপে দু'কুল ছাপিয়ে যাবে; বন্যা-কবলিত হয়ে পড়বে বসতি, ভূমি। ড. আইনুন নিশাতের মতে, উপকূলীয় এলাকার বাঁধই হলো আমাদের রক্ষাকবচ। বিপজ্জনক হচ্ছে, জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে, সমান তালে জলোচ্ছ্বাসও যদি বাড়ে তবেই শঙ্কা। ওই শঙ্কা মোকাবেলা করতে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

ক্লাইমেট সেন্ট্রাল-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও এই গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ড. স্কট কাপ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে আভাসগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমাদের নগর ও উপকূলীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। জোয়ারের সীমা বেড়ে ভূমিতে বসবাসকারী মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কতোদিন এবং কিভাবে উপকূলীয় মানুষগুলো টিকে থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।

ক্লাইমেট সেন্ট্রালের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাতাসে যদি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ আমরা ব্যাপকমাত্রায় কমিয়ে আনতে পারি, তাহলে হয়তো এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ যদি বর্তমান মাত্রায় স্থির থাকে, তাহলে পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হবে না। ফলে আমাদের উচিত, বাতাসে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপকমাত্রায় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রভাবশালী সাময়িকী 'ল্যানসেটে' প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের ঝুঁকি ৩৬% বেড়েছে।[৩] 'ল্যানসেট কাউন্টডাউন অন হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০১৯' নামের এই গবেষণা প্রবন্ধটি ১৪ নভেম্বর ২০১৯এ প্রকাশিত হয়।

ল্যানসেট-এর প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার বেড়েছে এবং শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশ। বাংলাদেশে ডেঙ্গু বিস্তারের ক্ষেত্রে উষ্ণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য- এই তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডেঙ্গু সংক্রমণের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়েরই আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন, বাংলাদেশে অসময়ে বৃষ্টিপাত ও তাপদাহের পরিমাণ বেড়েছে। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাদের জনস্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ডেঙ্গু ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।

দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বেশি। জানুয়ারি হতে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে ৯৩ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে; এ সময়ে মারা গেছে ৯৮ জন।

ল্যানসেট-এর গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য খাতে আরও বরাদ্দ বেড়েছে। এর ফলে তারা ডেঙ্গু ঝুঁকি ৩১ শতাংশ কমিয়ে আনতে পেরেছে। এর বিপরীতে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ডেঙ্গু ঝুঁকি বেড়েছে। বাংলাদেশে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গু ঝুঁকি প্রায় ৩৯ শতাংশ কমে গিয়েছিল কিন্তু ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে এই ঝুঁকি আবারও প্রায় ৩৬ শতাংশ বেড়ে গেছে।

গবেষণায় বলা হয়, ডেঙ্গু ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্যে দুটি বিষয় (সূচক) বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রথমটি হলো, ডেঙ্গু ছড়ানোর ক্ষেত্রে দুই ধরনের এডিস মশার (এডিস ইজিপ্টি ও এডিস অ্যালবোপিকটাস) উপযোগী জলবায়ুর উপস্থিতি। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ডেঙ্গু আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতা। এই সক্ষমতা পরিমাপ করা হয় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস কোর ক্যাপাসিটি মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে। এই দুটি সূচকের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে, বাংলাদেশ ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সালের ল্যানসেট কাউন্টডাউন গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এতে কাজ করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডন, যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি, চীনের ইউনিভার্সিটি অব শিংগুয়া, সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব জেনেভা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির ১২০ জন চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

দ্যা ল্যানসেট কাউন্টডাউন-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ড. নিক ওয়াটস এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, শিশুরা প্রধানত স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকে। কারণ, তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তখনও যথাযথভাবে তৈরি হয় না। এমনি এক সময়ে শিশুর শরীরে যদি এই ধরনের সংক্রমণ ঘটে, তবে তার পুরো জীবনে এর প্রভাব পড়ে। একারণে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এছাড়াও ল্যানসেট, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য-প্রভাব নিয়ে তাদের গবেষণা রিপোর্টে বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সংক্রমণ ও কীটপতঙ্গবাহিত রোগের ধরনে পরিবর্তন আসবে; তাপপ্রবাহে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে; জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে সরাসরি জখমের সংখ্যাও বাড়বে। বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজস্ব আবাস ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে গর্ভবতী মায়েদের জীবনে। তারা পান না ন্যূনতম স্বাস্থ্য-সুবিধা, ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তান জন্ম দেওয়া, লালন-পালনের কারণে অনায়াসেই সন্তানের শরীরে রোগ-ব্যাধি জায়গা করে নেবে।

বৃষ্টিপাত হ্রাস

ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ১৯৫১ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেরিক সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, বর্ষা মৌসুমের ব্যাপ্তি ও বৃষ্টির পরিমাপ ইত্যাদি উপাত্ত যাচাই করে দেখা গেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বৃষ্টিপাত কমছে। দেখা গেছে, চারদিনের বেশি সময় ধরে কমপক্ষে ২.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের ঘটনা কমে গেছে। যদিও স্বল্প সময়ের জন্য বৃষ্টিপাত বেড়েছে। কিন্তু এতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের চক্র দুর্বল হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি এজন্য আশঙ্কাজনক যে, এই উপমহাদেশের কৃষিকাজ দীর্ঘমেয়াদি বৃষ্টির উপযোগী। ইতোমধ্যেই (২০০৯) বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, ধানের ফুল আসার সময় থেকে বীজ বের হওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় টি-আমন জাতের ধানের উৎপাদন কমে আসছে। এমনকি ভরা বর্ষায় জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় অনাবৃষ্টিতে আমন ধানের বিশাল খেত রোদে পুড়েছে (২০১০)। যেখানে আমন ধান রোপনের অন্তত ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পানি ধরে রাখা নিশ্চিত করতে হয়, নাহলে কুশি বাড়ে না; সেখানে পানির অভাবে জমিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে, ২০১০ সালে (৪৭,৪৪৭ মিলিমিটার), বিগত ১৫ বছরের তুলনায় (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের পরে) সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে, এমনকি এই পরিমাণ ২০০৯ সালের তুলনায় ৯,০০০ মিলিমিটার কম।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি

বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর পানিপ্রবাহ শুকনো মৌসুমে স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে না। ফলে নদীর পানির বিপুল চাপের কারণে সমুদ্রের নোনাপানি যতটুকু এলাকাজুড়ে আটকে থাকার কথা ততটুকু থাকে না, পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের নোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল এলাকায়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এমনটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা পর্যন্ত উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং আরো উত্তরে বিস্তৃত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশে লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৮,৩০,০০০ হেক্টর, আর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এসে তা হয়েছে ৩০,৫০,০০০ হেক্টর। কম বৃষ্টিপাতের কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার সমস্যা দিনে দিনে আরো প্রকট হয়ে উঠবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।[৪]

সুন্দরবন

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এমন যে, কোথাও কোথাও ভূভাগ যথেষ্ট ঢালু। খুলনার সুন্দরবনের অবস্থান এমন একটা জায়গায়, যা ত্রিভুজাকৃতির বঙ্গোপসাগরের শীর্ষবিন্দুতে গাঙ্গেয় মোহনায় অবস্থিত। এই গাঙ্গেয় মোহনার মহীঢাল খুব মসৃণভাবে সমুদ্রে নেমে গেছে। এর ফলে আন্দামান

সাগরে উৎপন্ন জলঘূর্ণিঝড়গুলোর উত্তরমুখী যাত্রায় মহীঢালের অগভীরতার কারণে জলোচ্ছ্বাস অত্যন্ত উঁচু হয়ে আসে। সাগরের জোয়ারও অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়। তাই সাগরের নোনাপানি ঢুকে পড়ে উপকূলভাগে, লবণাক্ত করে তোলে ভূ-অভ্যন্তরের পানিও।[৫]

অস্বাভাবিক তাপমাত্রা

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বিগত কয়েক বছরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি ম্লান করে দিচ্ছে। ১৯৬০ সালে বঙ্গীয় এলাকায় সর্বোচ্চ ৪২.৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রা নথিভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ১৯৭২এর ৩০ মে তাপমাত্রা নথিভুক্ত করা হয় ৪৫.১° সেলসিয়াস, রাজশাহীতে। ১৯৯৫ এসে নথিভুক্ত করা হয় ৪৩° সেলসিয়াস। ২০০৯ সালের ২৬ এপ্রিল নথিভুক্ত করা হয় বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.২° সেলসিয়াস, যশোরে।[৬] তাপমাত্রার এই পরিসংখ্যানে আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে তাপমাত্রা কমছে, কিন্তু বস্তুত, অতীতের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিলো কম, অথচ বর্তমানে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা অত্যধিক বেশি। কেননা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড বা WWF-এর গবেষণায় দেখা যায়, শুধু ঢাকা শহরেই মে মাসের গড় তাপমাত্রা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ঐ মাসের তুলনায় বেড়েছে ১° সেলসিয়াস; নভেম্বর মাসে এই তাপমাত্রা ১৪ বছর আগের তুলনায় বেড়েছে ০.৫° সেলসিয়াস।[৭] আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ০.৫%।[৮] এমনকি ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪° সেলসিয়াস এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪° সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৯]

তাপমাত্রা বাড়ার ঘটনাটি অনেকটা সম্পুরক হারে ঘটবে। কেননা বাড়তি তাপমাত্রার কারণে পানির বাষ্পীভবন বেড়ে যাবে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।[১০] বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়া মানে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। আর্দ্র বাতাসের প্রভাবে প্রকৃত তাপমাত্রা না বাড়লেও অনুভূত তাপমাত্রা (feels like) বেড়ে যাবে। ফলে তাপমাত্রার তুলনায় বেশি গরম অনুভূত হবে। ইতোমধ্যেই একটি জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের আর্দ্রতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ভাগ এবং ২০৭৫ সাল নাগাদ তা প্রায় ২৭ ভাগ বেড়ে যাবে। এই আর্দ্রতা গরম বাড়িয়ে দিবে। উল্লেখ্য, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)-র মতে, ২০১০ সাল ছিল ২৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতম বছর, আর ২০০১ থেকে ২০১০ সময়টুকু ছিল বিশ্বের উষ্ণতম কাল।[১১]

গ্রীষ্মকালে যেখানে তাপমাত্রা বাড়বে, শীতকালে ঠিক একইভাবে তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে কমবে। ২০০৩ সালের পর ২০১১ সালে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়ে বাংলাদেশ। শ্রীমঙ্গলে নথিভুক্ত করা হয় ৬.৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রা। পরিবেশ ও জলবায়ুবিদদের মতে, এ সময় অনুভূত তাপমাত্রা হয়েছিল আরো কম।

মরুকরণ

দিনে দিনে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, সময়মত হচ্ছেনা বন্যা। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ছিল ২৩০০ মিলিমিটার, বরেন্দ্র এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১১৫০ মিলিমিটার। এরকম স্বল্প বৃষ্টিপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়ে খরায় আক্রান্ত হবে বিপুল সংখ্যক মানুষ, এর মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকই বেশি। গবেষকদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ।[১২]

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস

বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়ে দেখা দিচ্ছে স্থায়ী মরুকরণ। রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। অনাবৃষ্টির দরুণ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এছাড়া সুপেয় পানির অভাবে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায়ও ভূগর্ভস্থ পানি কমে যাচ্ছে।[১৩]

সুপেয় পানির অভাব

২০০৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরির্বতন-সংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) পানিসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের বেশ কটি দেশে সামনের দিনে মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। বিশেষ করে, দেশের উত্তরাঞ্চলে এই অভাব প্রকট। নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে পোরশা, সাপাহার, নিয়ামতপুর, ধামইরহাট, পত্নীতলা-এই পাঁচটি উপজেলা নিয়ে যে বরেন্দ্রভূমি, সেখানকার সরকারি-বেসরকারি ৫৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সবকটিতেই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাওয়ায় স্বাভাবিক নলকূপগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির সংকট। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে এমনিতেই যেখানে পানির স্তর কমে যায়, সেখানে গাছপালার প্রস্বেদন বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভের সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে।[১৪]

জলোচ্ছ্বাস

জলোচ্ছ্বাস বা সাইক্লোন যদিও স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জন্য একটি নৈমিত্তিক ঘটনা, কেননা ভারত মহাসাগরের উত্তর দিকের এই অঞ্চলটি যথেষ্ট ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অঞ্চল। প্রায় প্রতি বছরের এপ্রিল, মে, জুন এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ ও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় ও তা জলঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।[১৫] আর সেই তাণ্ডবে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় উপকূলবর্তী হাজার হাজার একর স্থলভাগ।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি দেশের তালিকা				
মরুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিতে অনিশ্চয়তা
মালাউয়ি	বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নীচু দেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিম্বাবুয়ে
ভারত	কম্বোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিশিয়া	মালি
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক	মলদোভা	ইন্দোনেশিয়া	জাম্বিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেক্সিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ (চাদ)	ভিয়েতনাম	চীন	বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্ডুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	রুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান
				সূত্র : বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দেয়া তথ্য মতে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০০, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জল-ঘূর্ণিঝড় হলেও তা তেমন ক্ষয়ক্ষতি করেনি। ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বলতে গেলে তেমন কোনো ঘূর্ণিঝড়ই হয়নি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে একদিকে যেমন বাড়ছে জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা, তেমনি বাড়ছে এদের সংখ্যা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় সিডর। তার মারাত্মক প্রভাব রেখে যেতে না যেতেই তার পিছু পিছু ২০০৮ সালের ২ মে ধেয়ে আসে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, একই বছর ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় রেশমি, ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় খাইমুক, ২৬ নভেম্বর নিসা, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল বিজলি, এবং ঐ বছরের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা। আইলায় খুলনা, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার উপকূলে বাঁধের (পানি উন্নয়ন বোর্ড- পাউবো'র বাঁধ) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০১৩ সালের ১-১৭ মে ঘূর্ণিঝড় ভিয়ারু, আনুষ্ঠানিকভাবে যা মহাসেন নামে পরিচিত হয়, আঘাত হানে চট্টগ্রামে। এতে ১৭ জন মারা যায়। ২০১৫এর ২৯ জুলাই ঘূর্ণিঝড় কোমেন ঘন্টায় ৭৫ কিমি বেগে চট্টগ্রামের নিকটে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট বন্যায় ১৩২ জন অধিবাসী, যার মধ্যে কোমেন-এর সরাসরি প্রভাবে ন্যূনতম ৩৯ জন মারা যায়। ২০১৬ সালের ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুও আঘাত হানে চট্টগ্রাম উপকূলে। এতে ২৬ জন নিহত হয়।

একই বছর ২০১৬ সালের ২০ আগস্ট ঘূর্ণিঝড় ডিয়ামু-এর আংশিক আঘাত বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। পরের বছর ২০১৭ সালের ৩০ মে ভোর চারটার দিকে ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন এলাকা অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড় তিতলি ২০১৮ এর ৬-৯ অক্টোবর পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ভারত মহাসাগরে জন্ম নেয়া এই ঘূর্ণিঝড়টি আমাদের উপকূল ভাগে চোখ রাঙিয়ে ভারতের কলকাতা থেকে ৮০০ কিলোমিটার দক্ষিণে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানে। ২০১৯ সালের ৪ মে সকালে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা অঞ্চল এবং এর আশেপাশের এলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ফণী। আঘাতের আগে এটি দুর্বল হলেও ১৮ জনের মৃত্যু হয়। এবছরই নভেম্বরের ১০ তারিখ সকালে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় বুলবুল দুর্বল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপকূলে ক্যাটাগরি-২ মাত্রার তীব্রতায় আঘাত করে। বলা হচ্ছে, এমন ব্যাপক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এর আগে দেখা গেছে ১৯৬০ সালে। তবে বাংলাদেশের জন্যে আশার কথা হ'ল, এটি বেশ দুর্বল হয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করে; তাই ক্ষয়ক্ষতি হয় কম।

শিলাবৃষ্টি

দিনে দিনে শিলাবৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। প্রতি বৈশাখে সাধারণত প্রাকৃতিক স্বাভাবিক কারণেই মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় এদেশে। ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে শিলাবৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেছে। ২০১০ সালের ২৭ মার্চ রাতে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি বয়ে যায় লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ ও হাতীবান্ধা উপজেলার উপর দিয়ে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ছোট শিলার ওজন আধা কেজির কম হবে না আর বড়গুলো দেড় কেজির মতো। কেউ কেউ ওজন করে দেখেছেন বলেও দাবি করেন। এতো বড় বড় শিলাবৃষ্টির আঘাতে অনেকের টিনের ঘর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। লোকজন ও গবাদি পশু আহত হয়। নষ্ট হয়ে যায় লিচুর আবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় গম, তামাক, ভুট্টা আর বোরোক্ষেত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এর আগে এতো বড় শিলার আঘাত তারা কখনোই শোনেননি।

বন্যা

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।[১৬] বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের নেপাল ও ভারতের বৃষ্টিপাতের পানি, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০৯৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রতি বছরই প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে। এদিকে পূর্বানুমান করা হয়েছে যে, শুধু বাংলাদেশেই ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ভাগ এবং ২০৭৫ সাল নাগাদ তা প্রায় ২৭ ভাগ বেড়ে যাবে। এই বাড়তি পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমুদ্রে যাবার সময় বন্যা হবে। এমনকি ২০১০ সালে বিগত ১৫ বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হলেও উত্তরাংশের সিলেট ও রাজশাহীতে আগের দুই বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত

হওয়ায় হাকালুকি হাওরসহ উত্তরাঞ্চলের বিপুল নিচু এলাকা প্রায় ৭ মাস ধরে প্লাবিত থাকে। কারো মতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বন্যায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৭ কোটি মানুষ।[১৭]

নদীভাঙন

বাংলাদেশে, সাধারণত বর্ষাকালে উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন নদীর পানি বেড়ে যায় এবং তা প্রচণ্ড গতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। এসময় উপকূলীয় অঞ্চলের নদীসংলগ্ন স্থলভাগে পানির তীব্র স্রোতে সৃষ্টি হয় নদীভাঙনের। বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিক চিত্র হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় তা আর স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হচ্ছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেয়া তথ্যমতে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার জুড়ে ভাঙন অব্যাহত আছে। আরও প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এলাকায় নতুন করে ভাঙন দেখা দিতে পারে। এতে কৃষি জমির এক বিরাট অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে। অথচ এর বিপরীতে যে চর জেগে উঠছে, তা অপ্রতুল।[১৮]

ভূমিকম্পের আশঙ্কা

প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও তার ব্যত্যয় ঘটে না। বিগত প্রায় ২৫০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯০০ সাল হতে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০০'রও বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে; এরমধ্যে ৬৫টিরও বেশি ঘটেছে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে। এ থেকে পরিষ্কার যে, গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে।[১৯]

বাংলাদেশে ৮টি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সীতাকুণ্ড-টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাট চ্যুতি এলাকা, ডাওকী চ্যুতি এলাকা, ডুবরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা (আংশিক-ডাওকি চ্যুতি) এবং রাঙামাটির বরকলে রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা।[২০] ভারতীয়, ইউরেশীয় এবং বার্মার (মায়ানমারের) টেকটনিক প্লেটের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেট দুটি ১৯৩৪ সালের পর থেকে দীর্ঘদিন যাবত হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে বড় ধরনের ভূ-কম্পনের। এছাড়াও পৃথিবীর মোট ১১টি মূল টেকটনিক প্লেটের ৭ নম্বর প্লেটটি মেঘালয়, মিয়ানমার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে মিয়ানমারের কাছেই সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে প্লেটটি আরেকটি প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে একটি চ্যুতি (রাখাইন চ্যুতি) তৈরি হচ্ছে, যা ৬.৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন স্বল্প মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে। মতবিরোধ থাকলেও অনেক ভূতাত্ত্বিক ছোট ছোট ভূমিকম্প সংঘটন বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে উল্লেখ করেন। অতীতের এসব তথ্য পর্যালোচনা করে গবেষকরা বলছেন, যেকোনো সময় বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।[২১]

সুনামির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত, বঙ্গোপসাগর অভ্যন্তরে F১, F২, F৩ এবং F৪ নামে ৪টি ভূ-কম্পন উৎস রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিই রিখটার স্কেলে ৭-৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে এবং যেকোনো সময় ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সুনামি ঘটাতে পারে।[২২] ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্র ৩০মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যে সুনামি, বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। ১৭৬২ সালে সমুদ্রতলে সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল, এমনকি ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ২১০০ কিলোমিটার দূরের সুমাত্রা থেকে বাংলাদেশের ফাটল বরাবর সৃষ্ট একটি ভূমিকম্পের দরুন সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। ১৭৬২ সালে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ফাটলটি এখনও সক্রিয় রয়েছে।

অস্ট্রেলীয় একদল ভূ-বিজ্ঞানী একটি জরিপে আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশের নদীবিধৌত পলি সমুদ্রতলে যে সকল পাহাড় বা টিলার সৃষ্টি করেছে, ভূমিকম্পের কারণে সেগুলোতে ধ্বস সৃষ্টি হলেও বড় ভূমিকম্প বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বাংলাদেশের উপকূলে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ফল্ট এলাকায় ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৪ মিটার (১৩ ফুট) উচ্চতার সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। এরমধ্যে নিঝুম দ্বীপ ৩মিটার (১০ফুট), সুন্দরবন, কক্সবাজার এবং ভোলার কিছু অংশ ২ মিটার (৬.৫ ফুট), ছোট ছোট চর ও দ্বীপাঞ্চল যেমন মনপুরা, মেঘনার মোহনা ইত্যাদি ২ মিটার (৬.৫ ফুট) উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস দ্বারা প্লাবিত হবে। এরকম সুনামি আঘাত হানলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, বাগেরহাট, খুলনা, বরিশাল ও সাতক্ষীরায় কয়েকশ' কিলোমিটার সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল বিপর্যস্ত হবে বলে আশংকা করা হয়।[২৩]

সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR)

বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলভাগ থাকায় দিনে দিনে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ডুবে যাবার শঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল-এর তথ্যমতে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।[২৪] 'দ্য সায়েন্টিফিক কমিটি অন এন্টার্কটিক রিসার্চ' (SCAIR) জানিয়েছে, যে হারে এন্টার্কটিকার বরফ গলছে, তাতে ২১০০ সাল নগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৫ ফুট বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিগত দিনের পরিসংখ্যানের প্রায় দ্বিগুণ এই হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (DFID) এ পরিমাণ উচ্চতাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এরকম অকস্মাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেশের প্রায় ৮%-এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্যমতে, ২০০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সমুদ্র, প্রতি বছর ৩ মিলিমিটার (০.১২ ইঞ্চি) করে বাড়ছিল, কিন্তু পরবর্তী দশকেই প্রতি বছর ৫ মিলিমিটার (০.২ ইঞ্চি) করে বাড়তে শুরু করেছে।[২৫] ২০০৩ সালে সার্কের "আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র" (SMRC)-এর একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, হিরণ পয়েন্ট, চর চাঙ্গা, এবং কক্সবাজারে জোয়ারের পানির স্তর প্রতি বছর যথাক্রমে ৪.০ মিলিমিটার, ৬.০ মিলিমিটার এবং ৭.৮ মিলিমিটার বেড়েছে।

ইউনেস্কো'র প্রতিবেদন মতে, সমুদ্রস্তরের ৪৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সুন্দরবনের ৭৫% ডুবে যেতে পারে।[২৬] ইতোমধ্যেই (২০০৯) সুন্দরবনের পশ্চিম বন বিভাগের সবচেয়ে গহীন অরণ্যে, বঙ্গোপসাগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মান্দারবাড়িয়া ক্যাম্পসহ ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার এলাকার ভূমি সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেছে, যেখানে সুপেয় পানির একমাত্র উৎস একটি পুকুর ছিল। নদীভাঙনের ফলে জঙ্গলের ছোট ছোট খাল ও নদী পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় জোয়ারের পানি একবার উঠলে আর নামতে পারছে না; পরবর্তী জোয়ারে আরও ভেতরে পানি যাচ্ছে বলে এসব এলাকার গাছপালার বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে।[২৭]

জলবায়ু উদ্বাস্তু

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি নদ-নদীর পানি কমে যাওয়া, জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে মাৎস্য সম্পদের (মাছ ও জলজ প্রাণী) ঘাটতির আশঙ্কা করা হয়। আবহাওয়াজনিত নানা পরিবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় খাদ্যঘাটতির আশঙ্কাও কেউ কেউ করে থাকেন। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টি হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়ার শঙ্কা।

নিকট অতীতে ২০০৯এর ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা'র কারণে খুলনার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নের কমপক্ষে দুশতাধিক পরিবার একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। আশঙ্কা করা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হতে পারে।[২৮] ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সংবাদ মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর এক থেকে দেড় কোটি মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।[২৯] আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ খুলনার দাকোপ ও কয়রা এলাকা ছেড়ে নিকটবর্তী শহর, রাজধানী ঢাকা, রাঙ্গামাটি পাড়ি জমিয়েছে।[৩০] ২০০৯ সালে ভোলা জেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ৬৫০টি পরিবার ঘর-জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে।[৩১] ২০০৮ সালে সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ৪২ হাজার মানুষ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় আচমকা বন্যায়।[৩২]

বিশেষত নদীভাঙ্গনের ফলে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। বাবা-মা হারিয়ে অনেক শিশু এতিম হয়ে পড়ছে। আর্থিক অনটন ও জীবন-জীবিকার উৎস হারিয়ে পড়া

পরিবারের শিশুরা ভোগে নানা রোগে-শোকে। বন্ধ হয়ে যায় তাদের লেখাপড়া, জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে যেতে বসে সেসব শিশুরা।

জীবিকার উৎস ধ্বংস

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর উপজীবীরা তাদের জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হয়। এতে দেশে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে। যেমন মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্বাদু পানির মৎস্যজীবী, সমুদ্রগামী জেলে, উপকূলীয় জেলে ও তাদের পরিবারগুলো জীবিকার উৎস হারাবে।[৩৩] এরকম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কক্সবাজারেরই লক্ষাধিক জেলে।[৩৪] সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ঘন ঘন নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় সতর্ক সংকেতের কারণে সমুদ্রগামী জেলেরা মাছ আহরণে বাধা পেয়েছে। সতর্ক সংকেতের কারণে বারে বারে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসায় তাদের পুঁজি হারিয়েছে, তবে তেমন আয় হয়নি; এতে দেনা-চক্র হতে তারা বের হতে পারছে না।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে মানুষ তাদের সহায়-সম্বল হারায়। গৃহস্থ পরিবারের গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি, বৃক্ষাদি, শস্য, মৎস্য সম্পদ, শস্যবীজ, গবাদি পশুর শুকনো খাদ্য, এমনকি মাছ ধরার জাল, ঝুড়ি, কিংবা জমি চাষের উপকরণ হারিয়ে যায়। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পর গবাদি-পশুর শুকনো খাদ্যের আকালে পড়ে অনেক পরিবার। এছাড়া সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর লবণপানির প্রভাবে লবণাক্ত জমি হয়ে পড়ে অনুর্বর। ফলে কখনও সাময়িক, কখনও দীর্ঘ সময়র জন্য এক বিরাট আর্থিক অনটনের মুখোমুখি হয় দুর্যোগ-আক্রান্ত মানুষেরা।

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রয়োজনে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে। নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতে ও চলমান দুর্যোগ মোকাবিলা করতে বিদ্যমান অবকাঠামোগত স্থাপনায় আনতে হচ্ছে নকশাগত ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন। যেমন– লোনা পানি ঠেকাতে দেশের উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের (পোল্ডার) নকশা পাল্টে মেরামত ও নতুন পোল্ডার তৈরি করা এবং নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তনে সেচ প্রকল্পের সংস্কার সাধন করতে হচ্ছে। তাছাড়া উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির সংস্কার কিংবা পুনর্নির্মাণে প্রতি বছর বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বিরাট অংশ মাৎস্য (মাছ ও অন্যান জলজ প্রাণী-যেমন কাঁকড়া) সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা থেকে শুরু করে চিকিৎসা খাতও এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার হেক্টর (এক হেক্টর = ২.৪৭ একর; এক একর = ১০০ শতক) পুকুর, ৫ হাজার ৪৮৮ হেক্টর বাওর এবং ১১ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। এছাড়া প্রায় ৪৪ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর মুক্ত জলাশয়ে (নদী, হাওর, বিল, খাল) ২৫০

প্রজাতির মাছের বসবাস, যার মধ্যে ২৪টি প্রজাতির প্রজননও এখানেই হয়ে থাকে। এই বিপুল মাৎস্যসম্পদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচের গবেষণা প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ২,১৮৯ মিলিয়ন ডলার, জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যা ১.৮১% নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে হওয়া ক্ষতির প্রায় ২০%-ই বাংলাদেশে হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব

বাংলাদেশ সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদবিষয়ক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিমালয় থেকে সৃষ্ট নদীসমূহ হতে প্রতি বছর ১০০ টন পলি এসে সমুদ্রে পড়ে আর তা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় এসে উপকূলে জমা হয়। হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলো হয়ে যে পলি বাংলাদেশে আসে, তার তিন ভাগের এক ভাগ দেশের ভেতরের নদী ও নদীতীরে জড়ো হয়। এর এক অংশ নোয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর এলাকার উপকূলীয় নদী, এবং বাকি অংশ সমুদ্র হয়ে (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড) ইন্দোনেশিয়ার দিকে চলে যায়, এভাবে নতুন ভূমি জেগে ওঠে। এছাড়াও ১৯৫০ সালে আসামে ভূমিকম্পের পর হিমালয়ের একটি বিশাল অংশের পলি হিমালয়-সৃষ্ট নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে। বিগত ৬৫ বছরে এভাবে পলি জমা হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে ১,৮০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি জেগে উঠেছে। আগামী ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে দেশের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলোতে পানির পরিমাণ বাড়লেও একই সঙ্গে পলির পরিমাণও বাড়বে।

গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মেঘনা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সক্রিয় বদ্বীপ এলাকা, যেখানে ভূমি এখনো (এপ্রিল ২০১০) গঠিত হচ্ছে। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সীমানায় অবস্থিত পশুর, শিবসা ও বলেশ্বর নদী দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পলি এসে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জড়ো হচ্ছে। নোয়াখালী উপকূলে সবচেয়ে বেশি ভূমি জেগে উঠেছে। ফলে দেশের বেশিরভাগ উপকূল ও নদীর তীরবর্তী এলাকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। সিইজিআইএসের গবেষণা পরিচালক মমিনুল হক সরকার পরিচালিত 'মেঘনা এস্টুয়ারি-ইফেক্ট অব ১৯৯৫ আর্থকোয়েক অ্যান্ড ফিউচার ডেভেলপমেন্ট' এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আরেকটি গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি 'বাংলাদেশের নদীর ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: মাঠপর্যায়ের গবেষণাভিত্তিক ফলাফল' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।[৩৫]

৫. নীতিনির্ধারকদের ভাবনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও প্যারিস চুক্তি

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে ১৯৯২ সালে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলা যায়, কার্বনের বিপদ সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী মানুষেরা তখন থেকেই আলোচনা করতে শুরু করে। আগে যে

বিষয়টি ছিল গবেষক-বিজ্ঞানী এবং সীমিত সংখ্যক নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই বিষয়টি অনেক বেশি নীতি-নির্ধারক এবং আম-জনতার মধ্যে চলে আসে। আজ দুনিয়াব্যাপী মানুষেরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে জানে। এবং এও জানে এর জন্যে দায়ী গ্রীনহাউজ গ্যাস তথা কার্বন ও কার্বন যৌগের গ্যাস। যা ধনী, উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়নের উপজাত (by-product) হিসেবে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে পৃথিবী উষ্ণায়নের জন্যে দায়ী এই গ্যাসগুলোর বিস্তার রোধে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার বিষয়ে বিশ্বনেতারাও কথাবার্তা বলতে শুরু করেন।

কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয় জাপানের কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে কোনো চুক্তি হয়নি, তবে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। যাকে বলা হয় কিয়োটো প্রোটোকল। সেই প্রটোকলে বর্ণিত বিষয়, বিশেষ করে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার বিষয়টি ধনী শিল্পোন্নত কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো মানতে রাজি হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতাই করে। যেহেতু প্রটোকল কোনো চুক্তি নয়, প্রোটোকল কাউকে মানতে বাধ্য করা যায় না; এ কারণে একটি চুক্তির কথা জোরেশোরে আলোচিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, ওই চুক্তিতে কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনার অঙ্গীকার এবং এরজন্যে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টি বর্ণিত থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের নেতৃত্বে এই আলোচনাটি হয়। যেখানে বিজ্ঞানীরা ও রাষ্ট্রপ্রধানরাও অংশ নেন। আলোচনার বিষয় কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনা এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো কিভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে, তার পথ বের করা। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলনকে কনফারেন্স অব পার্টি (Conferrence of Parties বা সংক্ষেপে CoP বাংলায় কপ) বলা হয়। সাধারণত প্রতি বছরেই একবার কপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালের ২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে কপ-এর ২৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই বৈঠকটি চিলিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সেদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বৈঠক আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ করায় মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয়।

কপ বৈঠকগুলোয় শীর্ষ নেতারা মিলিত হয়েও কার্বন গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনতে একমত হতে পারেননি। অনেক আলোচনা, আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়া, আবারও আলোচনায় ফিরে আসা, কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার দেশীয় পর্যায়ে অঙ্গীকার করা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ১৯৯৭ এর ১৮ বছর পর ২০১৫ এর নভেম্বর- ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্যারিস সম্মেলনে (কপ ২১) একটি যেনতেন গোছের চুক্তি হয়। মোটাদাগে প্যারিস চুক্তির বিষয় হলো :

১. যত দ্রুত সম্ভব বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধির হার শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি, এই শতকের মধ্যে বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাস তৈরি হওয়া এবং তার শোষণের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

২. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বাঁধতে হবে। তবে পাখির চোখ করতে হবে দেড় ডিগ্রির সীমাকে।

৩. এই লক্ষ্যে কাজ কতটা হয়েছে, তার মূল্যায়ন করতে হবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর।

৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু-সুরক্ষা খাতে বছরে ন্যূনতম ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিতে হবে। কাজ এগোলে ভবিষ্যতেও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলবে। প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণে কাজ এগোলে ২০২৫ সালে আর্থিক অনুদান বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হবে।

বিস্ময়কর হচ্ছে, কিয়োটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত ৩৭টি দেশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর আইনি বাধ্যবাধকতাসহ সমঝোতায় পৌঁছেছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের দশমিক ৭ শতাংশ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। ওই অঙ্গীকার পূরণ না হলে জরিমানার বিধানও ছিল। কিন্তু কোনো দেশই তা বাস্তবায়ন করেনি। আর প্যারিস চুক্তিতে রাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ না কমালে জাতিসংঘের বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কিছু বলার আইনি অধিকারও নেই।

চুক্তিতে জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতি (লস অ্যান্ড ডেমেজ) অংশে প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো সুকৌশলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি থেকে দায়মুক্তি নিয়েছে। কোনো দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে অন্য কোনো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়িত্ব বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো পালন করবে বলে চুক্তিতে বলা হয়। এর মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর বিমা কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশ থেকে উল্টো আরও বেশি অর্থ নিয়ে যাবে। ফলে এটি আসলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরও আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে। অথচ জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলো আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করবে তা চমৎকারভাবে লেখা হয়েছে।

যদিও প্যারিসের দর কষাকষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অর্থের যোগান। উন্নয়নশীল দেশগুলো দাবি তুলছে, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার বাদ দিয়ে সরাসরি নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের দিকে যেতে তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ এই খাতে বছরে ১শ' বিলিয়ন ডলারের যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে যাতে অনেক দেশই তুষ্ট নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে ২০২০ সালের পরেও বছরে ১শ' বিলিয়ন ডলারের সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছে তারা।

চুক্তি অনুযায়ী এই শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখাটাও একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ, চুক্তিতে রাষ্ট্রগুলো স্বপ্রণোদিতভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, তা যদি শতভাগ বাস্তবায়িতও হয়, তাহলেও বিশ্বের তাপমাত্রা এই শতাব্দীর মধ্যে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

তারপরও চুক্তিটি যে হতে পারলো এবং সকলেই একে মেনে নিল, এর কারণ, এতে সচেতনভাবেই এক ধরনের নমনীয়তা রাখা হয়েছে। এতে ১৯৫টি আলাদা দেশের বিচিত্র স্বার্থকে যেমন জায়গা

দেওয়া হয়েছে; তেমনি এর আইনি কর্তৃত্ব নেই বললে চলে। আইনি বাধ্যবাধকতার কড়াকড়ি কম থাকায় ধনী ও কার্বন নিঃসরণের জন্যে দায়ী দেশগুলোকে যেমন এই চুক্তি কার্যকরে বাধ্য করা যাবে না; আবার দরিদ্র ও বিপন্ন দেশগুলোর সরকারকে আশ্বস্ত করতে চুক্তিটিতে অনেক উদ্দীপনামূলক কথার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

প্যারিসে স্বার্থ ক্ষুণ্ন বাংলাদেশের

প্যারিসে টানা দুই সপ্তাহ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, দরকষাকষির পর বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে একমত হয়ে যে চুক্তিটি হলো, তাতে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ক্ষয়ক্ষতির দাবি, জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন তহবিলের জোগানসহ আরো কিছু বিষয়ে আগের চেয়েও কঠিন সব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় কিংবা আগে যেসব সুবিধা সহজ ছিল সেগুলো বাদ দেওয়া হয়।

উপরন্তু চুক্তিটি কার্যকর করা যাবে কি-না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, ২০১৭এর মধ্যে (প্যারিস সম্মেলনের পর দুই বছর) বিশ্বের বেশির ভাগ কার্বন নিগর্মনকারী ৫৫টি দেশের অনুমোদন পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে চুক্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। বলাইবাহুল্য, সকল দেশ এতে অনুমোদন দেয়নি। উপরন্তু, অন্যতম প্রধান দূষণকারী দেশ-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি হতে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এছাড়াও উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতির ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার ক্ষেত্রে ২০২০ সাল থেকে সময় বাড়িয়ে ২০২৫ সালে নিয়ে গেছে। যা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী।

আরও আছে চুক্তির ৫২ নম্বর সিদ্ধান্ত। যা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য কালো অধ্যায়। কারণ ওই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো দেশ নিজ থেকে দায়ী দেশগুলোর প্রতি দাবি জানাতে পারবে না। তবে উন্নত দেশগুলো তাদের মর্জি অনুসারে সহায়তা দিতে পারে। একই সঙ্গে 'মাইগ্রেশন' শব্দ বাদ দিয়ে কেবল 'ডিসপ্লেসমেন্ট' যোগ করা হয়েছে; যাতে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। সহায়তার ক্ষেত্রে এতে সমস্যা দেখা দেবে।

কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ও জলবায়ু বিজ্ঞানী বিজর্ন লুমবুর্গ চুক্তিটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই চুক্তি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ১ শতাংশ সমাধান করতে পেরেছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই চুক্তি বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারবে। এই চুক্তি সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হলে তা হবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল চুক্তি। কেননা, এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের ১৯৫টি দেশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে অঙ্গীকার করেছে, তাতে জ্বালানি খাতে রাষ্ট্রগুলোর খরচ অনেক বাড়িয়ে দেবে। এর পরিমাণ হতে পারে বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারের ওপরে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে অনেক দেশেরই বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) কমে যাবে। কিন্তু জলবায়ু তহবিল হিসেবে ২০২০ সাল থেকে এক কোটি ডলারের যে তহবিলের কথা বলা হয়েছে, তা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একদমই অপ্রতুল।

লুমবুর্গের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তবে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন, এমন বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ প্যারিস চুক্তিকে আশার ফুলঝুরি হিসেবেই দেখছেন। তাঁরা বলছেন, চুক্তিতে সব দেশের দাবি কোনো না কোনোভাবে আছে। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অর্থ দেওয়ার প্রধান দাবি বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চুক্তিতে নেই। একারণে চুক্তিটিকে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' বলা যেতে পারে।

সর্বোপরি, প্যারিস চুক্তিতে বিশ্বের সকল দেশের দাবি বিবেচনায় আনায় প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রগুলোর কী পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ কমানো উচিত এবং তারা কতটুকু কমানোর অঙ্গীকার করল, তা বিবেচনাই করা হয়নি। ফলে চুক্তি একটি আমরা পেয়েছি, যাতে শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দুই ধরনের দেশই তাদের অবস্থান থেকে ছাড় দিয়ে একমত হয়েছে যে, বিশ্বের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির নিচে রাখতে হবে। কিন্তু কিভাবে, তার ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা নেই। ফলে কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ করেই যাবে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের দেশগুলো তাদের উন্নয়নের স্বার্থে কার্বন নিঃসরণ করবে; আর স্বল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতির শিকার হচ্ছে বলে চিৎকার করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বাজার চাহিদা লক্ষ্য রেখে উন্নত দেশগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে। ফলে বলাই যায়, এই চুক্তিতে লাভবান হবে কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোই।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, প্যারিস চুক্তির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ কপ সম্মেলনেও (মাদ্রিদ কপ ২৫) কোনো অগ্রগতি হয়নি। আশা করা হয়েছিল, কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে যদি ধনী দেশগুলোর কোনো প্রতিশ্রুতি মেলে। কিন্তু তা হয়নি। সকলেই বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগ দুনিয়াব্যাপী বেড়েছে এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলা করা কঠিন হবে; তারপরও ধনী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমাতে কোনো অঙ্গীকার করেনি। এমনকি, সহায়তার অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও কোনো অগ্রগতি হয়নি।

৬. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপন্নতা থেকে কিভাবে রক্ষা বা মোকাবেলা করা যায়, তা নিয়ে দুনিয়াব্যাপী জোর আলোচনা চলছে। ধনী দেশগুলোর বিলাসিতায় গরীবদেশগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়েও দুনিয়া জুড়ে তর্ক-বিতর্ক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনায় মুখ্য তিনটি বিষয় উঠে এসেছে; এক, ক্ষতিকর গ্রীনহাউজ গ্যাসের উদগীরণ কমিয়ে আনা (reduce green-house gas emission); দুই, গ্রীনহাউজ গ্যাসের জন্যে দায়ী ধনী দেশগুলোকে ক্ষতির শিকার দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা (mitigation) এবং তিন, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো পরিবর্তিত অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়া বা খাপ খাওয়ানো (adaptation), যাকে অভিযোজনও বলা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর এই ক্ষতিকর পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় জাতিসংঘ নেতৃত্ব দিচ্ছে। বহুপাক্ষিক এই আলোচনার শুরু ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বালি সম্মেলনে। আশা করা হয়েছিল, ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত কোপেনহেগেন সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একটি নতুন কার্যকর চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে। এই আলোচনায় ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা না কমিয়ে অভিযোজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অবশ্য, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা না কমিয়ে শুধুমাত্র অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিক্ষর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করা অসম্ভব। এ কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২° সেলসিয়াসের নিচে রাখার জন্যে দাবি ওঠে। ধনী দেশগুলোকে এ লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের নিঃসরণকে ভিত্তি ধরে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৪০ ভাগ নিঃসরণ কমিয়ে আনার কথা আলোচনায় আসে। এছাড়া, অধিক নিঃসরণকারী কতিপয় উন্নয়নশীল দেশকেও (ব্রাজিল, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহ) একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নিঃসরণ কমিয়ে আনতে হবে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এসেও কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার মেলেনি; যদিও প্যারিসের বৈঠকে একটি চুক্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওই চুক্তির ভিত্তিতে কোনো কার্যকর বিধিমালা এখনও তৈরি করতে ধনী দেশগুলো একমত নয়। আর মিটিগেশনের টাকা তারা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে দিয়ে আর একটি ব্যবসা করতে চায়। অন্যদিকে, অধিকহারে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশও একদিন দূষণকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

অবশ্য, আমাদের জন্যে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন একটি বড় বিষয়। যেহেতু অভিযোজনের একটি সীমা আছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই, একারণে বিপুল সংখ্যায় দরিদ্র জনগণ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন বলে অনুমিত হয়। যার আলামত হিসেবে আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনার কয়রা উপজেলার উত্তর ও দক্ষিণ বেদকাশী, দাকোপ উপজেলার সুতারখালী ও কামারখোলা ইউনিয়ন এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এলাকা ত্যাগ করেছেন। ওই এলাকার অনেকেই মনে করেন, ওখানে আর বসবাস করা যাবে না। উপকূলীয় এলাকায় নোনা বা জোয়ারের পানি ঠেকানোর জন্যে বাঁধ আরও উঁচু ও শক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আবার মুনাফার কারণে বাঁধের ক্ষতি করে এলাকাকে লবণাক্ত জলাভূমিতে পরিণত করেছি। আবার বাঁধ ব্যবস্থার কারণে নদী মরে গিয়ে নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিকল করে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে সৃষ্ট বন্যা; আবার সমুদ্রের নোনা পানি ঠেকানোর জন্যে বাঁধ দেয়ার বিকল্প না থাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সহায়তার বদলে ঋণের ফাঁদ– সবকিছু মিলিয়ে আমরা এক জটিল পরিবেশ-প্রতিবেশ-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

তথ্যপঞ্জি

১. Climate Change: Bangladesh Facing the Challenge, অনলাইন, বিশ্বব্যাংক, তারিখ অজানা, আর্কাইভ হতে সংগ্রহ করা, সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২২, ২০১০

২. গৌরাঙ্গ নন্দী, বন্যা ঝুঁকিতে পড়বে সোয়া চার কোটি মানুষ, *কালের কণ্ঠ*, (প্রিন্ট), অক্টোবর ৩০, ২০১৯, ঢাকা

৩. গৌরাঙ্গ নন্দী, দেশে ডেঙ্গু ঝুঁকি বেড়েছে ৩৬%, *কালের কণ্ঠ*, নভেম্বর ১৪, ২০১৯ (প্রিন্ট), ঢাকা

৪. গৌরাঙ্গ নন্দী এবং অন্যান্য, চিংড়ি ও জন-অর্থনীতি : কার লাভ কার ক্ষতি; ২০০৭, *অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ*

৫. খসরু চৌধুরী, জলবায়ু পরিবর্তনের থাবা পড়েছে সুন্দরবনেও, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ৭

৬. নিউজ-বাংলা ডেস্ক, দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ১৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে, এপ্রিল ২৬, ২০০৯, *নিউজ বাংলা*, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৭. সাগর সরওয়ার, সমাজ জীবন : এশিয়ার মেগাসিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা (অনলাইন), ডয়েচে ভেলে, জার্মানি, ১৬ নভেম্বর ২০০৯

৮. নিউজ-বাংলা ডেস্ক, দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ১৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে, এপ্রিল ২৬, ২০০৯, *নিউজ বাংলা*, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৯. Satter, Fazlous, Conflict Resulting from Climate Change in Bangladesh, গবেষণা প্রতিবেদন, অনলাইন, CHRDHS

১০. Koudstaal, Rab, Considering Adaptation to Climate Change Towards a Sustainable Development of Bangladesh, অনলাইন

১১. ইফতেখার মাহমুদ, আবহাওয়ার বৈরী আচরণ বিশ্বজুড়ে, *প্রথম আলো*, জানুয়ারি ১৫, ২০১১, ঢাকা

১২. মুশফিকুর রহমান, জলবায়ু পরিবর্তন : কারও কারও জন্য সুখবর, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), আগস্ট ১৬, ২০০৯, ঢাকা

১৩. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৪. ফরিদুল করিম, খাওয়ার পানির জন্য কতদূর, *কালের কণ্ঠ* (প্রিন্ট ভার্সন), জুন ২১, ২০১০, ঢাকা

১৫. Alal Uddin, Cyclone Sidr and Bangladesh, *Professors Current Affairs*, January 2008, Dhaka

১৬. জাবেদ সুলতান, বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ : দরকার দেশব্যাপী প্রচারণা, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন) জুলাই ১৯, ২০০৯, ঢাকা

১৭. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৮. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা,

ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৯. সিফাতুল চৌধুরী, কাদের ও খান, আফতাব আলম, ভূমিকম্প, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

২০. সিফাতুল চৌধুরী, কাদের ও খান, আফতাব আলম, ভূমিকম্প, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

২১. Staff Writer, Bangladesh Faces High Earthquake Risk, Warn Experts (Online), IANS,; India eNews

২২. মোহাম্মদ আবু তালেব, সুনামি শঙ্কামুক্ত নয় বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৪, ২০১১, ঢাকা

২৩. মোহাম্মদ আবু তালেব, সুনামি শঙ্কামুক্ত নয় বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৪, ২০১১, ঢাকা

২৪. সাগর সরওয়ার ও আব্দুল্লাহ আল ফারুক, জলবায়ু পরিবর্তন, আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে হবে (অনলাইন), নভেম্বর ২৪, ২০০৯, জার্মানি, ডয়েচে ভেলে

২৫. George, Nirmala; Disputed Island in Bay of Bengal (Associate Press AP), March 27, 2010, (Online)

২৬. *Case Studies on Climate Change and World Heritage,* UNESCO, 2007

২৭. সাগর সরওয়ার, সমাজ জীবন, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সুন্দরবন, অক্টোবর ৩০, ২০০৯, (অনলাইন) ডয়েচে ভেলে, জার্মানি

২৮. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

২৯. Flooding Hits Bangladesh (Online Video), National Geographic, August 27, 2009

৩০. গৌরাঙ্গ নন্দী, আইলার আঘাতের ৯ বছর আজ, কেউ পাহাড়ে কেউ বাঁধে, *কালের কণ্ঠ*, মে ২৫, ২০১৮ (প্রিন্ট ভার্সন), ঢাকা

৩১. শিশির মোড়ল, নেয়ামতউল্লাহ এবং মানিক মজুমদার, ভাঙনে ছোট হচ্ছে ভোলা, হারিয়ে যাবে হাতিয়া, বিশেষ সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

৩২. আহসানউদ্দিন আহমেদ, জলবায়ু-উদ্বাস্তুরা যাবে কোথায়, বিশেষ সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

৩৩. আনোয়ারা বেগম, ঝুঁকিতে মৎস্যসম্পদ, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯

৩৪. আরাফাতুল ইসলাম, সমাজ জীবন, বদলে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর, হুমকির মুখে জেলেরা, (অনলাইন), ডয়েচে ভেলে, জার্মানি, অক্টোবর ২১, ২০০৯

৩৫. ইফতেখার মাহমুদ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে নতুন তথ্য : বাংলাদেশ ডুববে না, *প্রথম আলো*, এপ্রিল ২৩, ২০১০

ব্যবহৃত ওয়েব লিংকসমূহ

১. www.dw.com

২. https://www.prothomalo.com

৩. http://www.kalerkantho.com

৪. www.thelancet.com

৫. www.climatecentral.org

৬. https://www.scientificamerican.com/article/special-report-climate-change

৭. unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf

৮. http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-full.pdf

৯. https://link.springer.com/journal/10584

১০. en.wikipedia.org/wiki/global_warming

১১. https://www.nature.com

সাক্ষাৎকার

১. উমাশঙ্কর রায়, গ্রাম ও ডাক- কালিগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

২. গৌরপদ বাছাড়, জয়নগর, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৩. মানিক রায়, ছোট জালিয়াখালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৪. অমল ঢালী, জালিয়াখালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৫. শিবপদ ঢালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৬. অলোক সরদার, গুণারী, সুতারখালি, দাকোপ, খুলনা

৭. ফকিরচাঁদ মণ্ডল, গুণারী, সুতারখালি, দাকোপ, খুলনা

৮. মন্টু হালদার, বটবুনিয়া, তিলডাঙ্গা, দাকোপ, খুলনা

৯. শঙ্কু রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১০. বাবলু রায়, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১১. বিপ্লব রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১২. বিষ্ণু রায়, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১৩. কালিপদ রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১৪. যামিনী মণ্ডল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৫. বারিক মোড়ল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৬. জালাল গাজী, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৭. আরিফা বেগম, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৮. সুবাস সরকার, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৯. বীরেন্দ্রনাথ সরদার, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

২০. অরুণ মণ্ডল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

২১. মেহেদী হাসান, প্রধান নির্বাহী, ক্লিন, খুলনা

২২. দেবব্রত সরকার, প্রধান নির্বাহী, লোকজ, খুলনা